যে সংগ্রামের শেষ নেই

প্রমথ গুপ্ত

ধ্রুবদ্যুতি
প্রকাশন

যে সংগ্রামের শেষ নেই
প্রমথ গুপ্ত
প্রচ্ছদ: মোস্তাফিজ কারিগর

প্রকাশক: ধ্রুবদ্যুতি ও দ্যু প্রকাশন
দ্বিতীয় মুদ্রণ: ফাল্গুন ১৪৩২, ফেব্রুয়ারি ২০২৬
প্রথম বাংলাদেশি সংস্করণ: আশ্বিন ১৪৩০, অক্টোবর ২০২৩
প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৭৮, কলকাতা

Je Sangramer Shesh Nei
[ENDLESS STRUGGLE]
by Pramath Gupta
Cover Designed by Mostafiz Karigar
First Bangladeshi Edition: October 2023
Second Print: February 2026 by Dyu Publication & Dhrubadhuti

www.dyu.com.bd
ISBN: 978-984-98149-0-0
Printed & Bound in Bangladesh

পূর্বাভাস

ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের পাশঘেঁষে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর সমতলের কৃষকদের আন্দোলন সংগ্রামের ওপর কয়েকজন বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে শেরপুরের কমরেড প্রমথ গুপ্ত'র নাম সর্বাগ্রে স্মরণ করতে হয়। তাঁর *যে সংগ্রামের শেষ নেই* প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে। এ গ্রন্থটি প্রমথ গুপ্ত'র গবেষণা ও জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল। ময়মনসিংহের উত্তরাংশের টংক আন্দোলনসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত কমিউনিস্টদের আন্দোলন নিয়ে তাঁর প্রথম বই এটি।

কমরেড মণি সিংহের 'জীবন সংগ্রাম' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৯০ বঙ্গাব্দে। তিনি বইটি লিখতে যেয়ে বর্তমান গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছিলেন, তা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মণি সিংহ নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই *জীবন সংগ্রাম* রচনা করেছিলেন। তবে তিনি জীবনের শেষার্ধে বইটি লেখার জন্য হয়তো অন্যান্য লেখকের গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছিলেন।

মণি সিংহের মতো প্রমথ গুপ্ত সরাসরি টংক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়িসহ শেরপুর অঞ্চলের আদিবাসী ও বাঙালি কৃষকদের মাঝে থেকে কাজ করতেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি বামধারার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩২ সালে কারাবন্দী ছিলেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে রাজনীতি তাঁর রক্তমাংসের সঙ্গে মিশে যায়। তিনি সার্বক্ষণিক

রাজনীতি শুরু করেন। তিনি রাজনীতির পাশাপাশি সাংবাদিকতার সঙ্গেও সম্পৃক্ত ছিলেন, এতে তিনি অধিকাংশ ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা সময়মত করে গেছেন। বইটিতে স্থানীয় শব্দের ব্যবহার বেশি। এতে পাঠে বিঘ্ন ঘটতে পারে। আর একটি কথা না বললেই নয়; প্রমথ গুপ্ত'র কর্ম এলাকার উপর বর্ণনা একটু বেশিই বলে মনে হয়। মণি সিংহের *জীবন সংগ্রাম*, প্রমথ গুপ্তের *যে সংগ্রামের শেষ নেই* ও মৌলভী আব্দুল হান্নানের *আমার জীবনে কমিউনিষ্ট পার্টি*—এই তিনটি বই পাশাপাশি পড়লে টংক আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তর ধারণা পাওয়া যাবে বলে আমার মনে হয়।

প্রমথ গুপ্ত'র একই ধরনের গ্রন্থ *মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী*। এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮২ সালে। তৃণমূলের কৃষকদের অধিকার আদায়ের জন্য সচেতন করতে কমরেড মণি সিংহ, কমরেড প্রমথ গুপ্ত'র মতো ইতিহাস সচেতন রাজনৈতিক নেতারা যদি গ্রন্থগুলো লিখে না যেতেন তাহলে আমাদের বিভ্রান্তিতে পড়তে হতো। ইতিহাস চর্চা করতে আমাদের ব্রিটিশ কিংবা পাকিস্তানিদের নথিপত্রে সহায়তা ছাড়া উপায় ছিল না। তাদের নথিতে শুধু তাদের কথা পাওয়া যেত, কৃষকদের কথা আমরা জানতে পারতাম না। সে শাসকশ্রেণির অসত্য-অর্ধসত্য তথ্য আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক পর্যায়ে ঠাঁই করে নিত, তাতে সন্দেহ নেই।

এই গ্রন্থে বাক্যগঠন ও বানানরীতি যেভাবে ছিল, আমরা সেভাবেই রেখেছি, পরিবর্তন, পরিমার্জন কিংবা সংশোধন করিনি। শুধুমাত্র একই বানানের একাধিক রূপ পরিত্যাগ করে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

টংক আন্দোলন সম্পর্কে জানতে যেমন *জীবন সংগ্রাম*, *আমার জীবনে কমিউনিষ্ট পার্টি* বইদুটি পড়া প্রয়োজন, তেমনি প্রমথ গুপ্তের *যে সংগ্রামের শেষ নেই*, প্রত্যেক রাজনৈতিক-সচেতন ইতিহাস পাঠকের অবশ্যপাঠ্য।

আলী আহাম্মদ খান আইয়োব
আগস্ট ২০২২, নেত্রকোণা

সূচিপত্র

ভূমিকা	৯
লেখকের কথা	১১
প্রকৃতির লীলাভূমি	১৪
গারো দেশ	১৮
সন্ন্যাসী বিদ্রোহ	২৩
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	২৮
সংগ্রামী ঐতিহ্য	৩২
প্রজাস্বত্ব আইন	৪০
আইন অমান্য আন্দোলন	৪৬
মহাজন বিরোধী বিদ্রোহ	৪৯
কৃষক সভার গোড়াপত্তন	৫৯
আন্দোলন ও সংগঠন	৬৯
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও মুক্তিসংগ্রাম	৮১
ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন	৯১
নালিতাবাড়ী (ষষ্ঠ প্রাদেশিক) সম্মেলন	৯৫
১৩৫০ সনের মন্বন্তর	১০০

নেত্রকোণা সম্মেলন
সারা ভারত কৃষক সভা : নবম অধিবেশন ১০৬
আইন সভার নির্বাচন ১১৬
যুদ্ধোত্তর যুগে গণঅভ্যুত্থান ১১৮
মুক্তাগাছা সম্মেলন ১৩২
ভারতের মুক্তি ১৩৫
সশস্ত্র প্রতিরোধ ১৪২
অমর লড়াই—নূতন ঢেউ ১৭১
পরিশিষ্ট
ময়মনসিংহ জেলার শহীদদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১৮০
ময়মনসিংহ জেলার কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র আন্দোলনের নেতা, সংগঠক ও বিশিষ্ট কর্মী ১৮৭
যে সব বই হইতে সাহায্য পাইয়াছি ২০০

ভূমিকা

শ্রী প্রমথ গুপ্ত ময়মনসিংহ জেলার হাজং উপজাতির সমস্যা ও আন্দোলন নিয়ে অনেক বছর ধরে গবেষণা করেছেন। তিনি স্বয়ং হাজং আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও নেতা। হাজং আন্দোলনে যে কৃষকরা পুরোভাগে ছিলেন তাঁদের তিনি খুব কাছে থেকে দেখেছেন। পেশাদার ঐতিহাসিকদের মতো তিনি শুধু পুরনো দলিলপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেননি, তাঁর গবেষণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কৃষক আন্দোলনের ধারা ও প্রকৃতি বুঝতে হলে সরকারী দলিলপত্র যথেষ্ট নয়। মনে রাখতে হবে যারা এই দলিলপত্র লিখেছেন তাঁরা সরকারী কর্মচারী। এবং তাঁদের কাছে কৃষক আন্দোলন শুধু আইন ও শৃঙ্খলার সমস্যা।

অবিভক্ত বাঙলায় মৈমনসিংহ জেলা ছিল কৃষক আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটি। এই জেলার কৃষকদের একটা বড় অংশ মুসলমান এবং আদিবাসী। কৃষক সভার মধ্যে বর্ণহিন্দু, মুসলমান এবং হাজং কৃষক সংগঠিত হয়েছিল। শহরে বসে কৃষি বিপ্লবের স্বপ্ন না দেখে একদল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী গ্রামে বাস করে কিভাবে কৃষক সভা গড়ে তুলছিলেন শ্রী প্রমথ গুপ্ত তার বর্ণনা দিয়েছেন। জমিদারী প্রথা এবং টংক প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। টংক প্রথার বিরুদ্ধে হাজং কৃষকদের আন্দোলন ছিল সবচেয়ে তীব্র ও ব্যাপক, স্বভাবতই এই আন্দোলন বইতে গুরুত্ব পেয়েছে। ইতিপূর্বে আর কোন লেখক হাজং আন্দোলন সম্পর্কে এত বিস্তৃত আলোচনা করেননি। দেশ বিভাগের পরে

১৯৪৯-৫০ সালে হাজং আন্দোলন সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল, সরকারী দমননীতির মুখে এই আন্দোলন দুর্বল হয়ে যায়। তারপর আসে সাম্প্রদায়িক সংঘাত। আন্দোলন একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। ভাঙনের এই পর্বটির আলোচনা খুব সংক্ষিপ্ত। প্রশ্ন থেকে যায় হাজং কৃষকদের ১৯৪৯-৫০ সালে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ অনুসরণ করা সঠিক হয়েছিল কি না।

শ্রী প্রমথ গুপ্ত টংক প্রথা, নানকার প্রথা, ভাওয়ালী প্রথার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। বাঙলার কৃষি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য শুধু জমিদারী প্রথা নয়; এই প্রথার মধ্যে বিকশিত হয়েছিল বর্গা, টংক, নানকার প্রভৃতি প্রথা। এই সব প্রথার বৈশিষ্ট্য ফসলে খাজনার হার রাজস্বের হারের তুলনায় অনেক গুণ বেশি। তদুপরি জমির মালিক চাষের কোন খরচ বহন করতেন না। দেখা গেছে যে এই সব প্রথার বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন অতি দ্রুত ব্যাপক এবং জঙ্গীরূপ নিয়েছে। বর্গা প্রথার বিরুদ্ধে তে-ভাগা আন্দোলন এবং টংক প্রথার বিরুদ্ধে হাজং আন্দোলন এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। ময়মনসিংহ জেলায় ১৯৪৬ সালে এই দুটি আন্দোলন পাশাপাশি চলছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টংক প্রথার বিরুদ্ধে হাজং কৃষকদের আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু কেন? শ্রী প্রমথ গুপ্তের লেখা পড়ে মনে হয় কৃষক সভা হাজং কৃষকদের আন্দোলন সংগঠিত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল, তে-ভাগা আন্দোলন তাই মাঝপথে থেমে গেল।

বাঙলার কৃষক আন্দোলনের পুরনো লেখার কাজ এখনো বাকী। সুখের বিষয় কৃষক আন্দোলনের পুরনো নেতারা এই কাজ শুরু করেছেন। আবদুল্লা রসুলের *কৃষক সভার ইতিহাস* প্রকাশিত হয়েছে। শ্রী প্রমথ গুপ্ত একটি জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস লিখেছেন। মনে হয় এই ধরনের প্রচেষ্টা কৃষক আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার কাজে সাহায্য করবে।

সুনীল সেন
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
২৩শে জানুয়ারী ১৯৭১

লেখকের কথা

আমাদের বাঙ্গালী জাতীয় জীবন আবার এক কঠিনতম সংকটে পড়িয়াছে। বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের ইঙ্গিতে পাকিস্তানের 'সামরিক জুন্টা' পূর্ববাংলায় ফ্যাসিস্ট আক্রমণ শুরু করিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থান ও সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম চলিতেছে। বাঙ্গালীর রক্তে বাংলাদেশের নতুন ইতিহাস রচিত হইতেছে। আর সমাজবিরোধী, আততায়ী ও হটকারী সন্ত্রাসবাদীরা পশ্চিম বাংলার মেহনতি জনতার যুক্ত আন্দোলন ও বিপ্লবের অগ্রগতি ব্যাহত করিতেছে। এখানেও সংগ্রামী জনতা স্বেদ-রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে প্রতিবিপ্লবকে প্রতিহত করিতেছে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বহু সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী এই উভয় বাংলার ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন ও গণ-সংগ্রাম ছিল দৃপ্ত মহিমাময় ও গৌরবোজ্জ্বল।

'সন্ন্যাসী বিদ্রোহের' সময়, ১৭৬৩ সাল হইতে ১৯২৮-২৯ সালের বিশ্বমন্দা পর্যন্ত সুদীর্ঘ দেড়শত বৎসর কাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন, ছোট, বড়, বহু কৃষক বিদ্রোহ হইয়াছে। ময়মনসিংহ জেলার কৃষকদের বিদ্রোহ তাহার মধ্যে অন্যতম। জমিদারদের 'বিদ্রোহী মহল' বলিয়া চিহ্নিত মৌজা ও গ্রামগুলিই তাহার প্রমাণ। 'পূর্ববঙ্গের লুই ব্লাঙ্ক' টিপুর নেতৃত্বে 'পাগল বিদ্রোহ',

দুবরাজ ও জানকুর নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ, 'হাতি খেদা' বিদ্রোহ এবং সাধারণভাবে গারো বিদ্রোহের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

পরে, ১৯৩০ সালে কিশোরগঞ্জে কৃষক বিদ্রোহ হইতে শুরু করিয়া ১৯৫০ সাল পর্যন্ত টংক, নানকার ভাওয়ালী ও 'তে-ভাগা' প্রভৃতি সামন্ততন্ত্র জমিদারী প্রথা বিরোধী আন্দোলনগুলি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পাক-ভারতের শাসকগোষ্ঠী তাহা স্বীকার করিতে নারাজ। শুধু কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ স্বাধীনতা আনিয়াছে ইহাই তাহাদের সম্পূর্ণ শ্রেণীস্বার্থে সংকীর্ণ শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই এই বিকৃত প্রচার।

'মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী' প্রকাশের সময় হইতেই আশা করিতেছিলাম, যে কোন যোগ্যব্যক্তি সারা ময়মনসিংহের কৃষক আন্দোলনের ইতিবৃত্ত উন্নততর বিস্তৃতভাবে রচনা করিবেন। ইতিমধ্যে 'কালান্তর', 'সপ্তাহ', 'পরিচয়', 'মূল্যায়ন' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় সংবাদ ও কাহিনী আকারে কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। ফলে ময়মনসিংহ জেলার সংগঠন ও আন্দোলন সম্বন্ধে জানার আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কমরেড মণি সিংহ, সুধীন রায় (খোকা রায়), বর্তমানে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম সংগঠনে ব্যাপৃত। কমরেড সুনির্মল সেন নামখানায় ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত। আমরা তাঁহাদের সহকর্মীরাও বিচ্ছিন্ন হইয়া দিন যাপন করতেছি। সকলে একত্রে বসিয়া কোন কিছু রচনা করার অনুকূল পরিবেশ হইতে আমরা আজ বঞ্চিত। অথচ, আমাদের জীবনের এক উজ্জ্বল সংগঠন ও বহু দৃপ্ত আন্দোলনের গৌরবময় ঘটনাবলী কালস্রোতে বিলীন হইয়া যাইতেছে। তাই, আমি আমার অক্ষমতা, অযোগ্যতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়াই কালির আঁচড়ে উহা যতটা

সম্ভব ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলাম। ভবিষ্যত ইতিহাস রচনায় সত্যান্বেষী ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস সমৃদ্ধতর হইবে।

১৯৩৭ সাল হইতে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবক-মহিলা প্রভৃতি গণ-সংগঠন ও গণ-আন্দোলনগুলি কমিউনিষ্ট কর্মীগণ নিরলস ও কঠোর পরিশ্রম করিয়া গড়িয়া তোলেন। এবং একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিই সমস্ত শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ গণ-সংগ্রামের পুরোধা ছিল। কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক-সাংগঠনিক নেতৃত্বই ছিল শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি। কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাস লেখা হইলে এই পুস্তকে বর্ণিত অনেক ঘটনার রাজনৈতিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য আরো উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হইবে। সেই জন্য 'শর্বরীর প্রতীক্ষায়' রহিলাম।

আমাদের ভূমিব্যবস্থা ও কৃষক সমস্যা সম্বন্ধে সুপণ্ডিত এবং এক সময়ে কৃষক আন্দোলনের নেতা ডক্টর সুনীল সেন মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দেওয়ায় ইহার মূল্য ও মর্যাদা নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

এই পুস্তক রচনার কাজে সাহায্য করিয়াছেন কমরেড জিতেন সেন, হারু ভট্টাচার্য ও জলধর পাল। আমার আশৈশব রাজনৈতিক বন্ধু অধ্যাপক শান্তিময় রায় এবং শ্রীচিন্মোহন সেনবীশ মহাশয়ের মূল্যবান পরামর্শ ও সাহায্য না পাইলে এই পুস্তক কিছুতেই প্রকাশিত হইত না। আমি তাঁহাদের সকলের নিকট ঋণী রহিলাম।

প্রমথ গুপ্ত

প্রকৃতির লীলাভূমি

১৯৩৬ সালে উত্তর প্রদেশে লক্ষ্ণৌ শহরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কৃষক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মীদের এক সম্মেলনে সারা ভারত কৃষক সভা গঠিত হয়। কৃষক সভার লক্ষ্য ছিল, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। আদর্শ ছিল স্বাধীন ভারতে 'কৃষক শ্রমিক রাজ'। ১৯৪৭ সালে ভারত (পাকিস্তান) যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তাহা খণ্ডিত ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা মাত্র। অখণ্ড বাংলার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার আওয়াজ ছিল—'লাঙ্গল যার, জমি তার।' সেই বাংলা আজ দ্বিখণ্ডিত। ইহার কোন খণ্ডেই কিন্তু যাহার লাঙ্গল তাহার জমি আজও আইনত স্বীকৃত হয় নাই। শুধু জবর দখলের যুগ চলিয়াছে। বর্তমানে কাহার ভোগ দখলে কত জমি থাকিবে তাহার সীমা বা পরিমাণ নির্ধারণে সকলে ব্যতিব্যস্ত। তাই 'কৃষক শ্রমিক রাজ' এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া 'লাঙ্গল যার জমি তার' দাবীতে কত শত সহস্র অযুত লক্ষ কৃষক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করিয়াছেন,—কী মহীমাময় অমর ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহা নতুন করিয়া বারবার স্মরণ করা প্রয়োজন। ময়মনসিংহ জেলার কৃষকদের অতীত ইতিহাস সেই দিক হইতে পরম সম্পদশালী।

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলাদেশ। আর সবচেয়ে কৃষি-প্রধান পূর্ব বাংলা। তাহার প্রধান জেলা ময়মনসিংহ। শুধু অখণ্ড

বাংলায় নয়, বিভাগ পূর্ব সারা ভারত ভূখণ্ডে এই ময়মনসিংহ ছিল বৃহত্তম ও কৃষিতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জেলা। এই জেলার উত্তরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি গারো পাহাড়। নীল আকাশের নীচে ধুসরায়মান শাল বনানীর ছায়া, ধুসরতর তাহার ঘন গহীন বন। অজস্র পাহাড়ী ঝর্ণা। ছোট ছোট নদীর বাঁকে বাঁকে আদিবাসীদের গ্রাম। দক্ষিণে বহু অতীত ঐতিহ্যের অধিকারী ও বর্তমানে সমুজ্জ্বল ঢাকা মহানগরী, পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। পূর্বে শ্রীহট্ট জেলা ও মেঘনা নদী। পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র, পরে রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলা। এই জেলার উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হইতে দক্ষিণে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র। তাহার দক্ষিণ তীরে জেলার ঠিক মধ্যস্থলে সদর শহর ময়মনসিংহ। প্রাচীন নাম নাসিরাবাদ। উপর অংশে মালঝী, কংশ, সোমেশ্বরী, মধ্যভাগে পবিত্র ব্রহ্মপুত্র এবং দক্ষিণে বানাস্, লৌহজঙ্গ প্রভৃতি নদ-নদী-বিধৌত এই জেলা। বিরাট বিরাট খাল, বিল, হাওর এবং মধ্যস্থলে মধুপুর ও জয়েনসাহী পাহাড় গড়কে বক্ষে লইয়া এই ভূখণ্ড। এই জেলার ছয়টি মহকুমা—সদর উত্তর, সদর দক্ষিণ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, টাঙ্গাইল। প্রত্যেকটি মহকুমা সর্ব-বিষয়ে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। গোটা জেলা কৃষি সম্পদে ঐশ্বর্যশালী। জেলার উত্তরে পাহাড় সীমান্ত অঞ্চল পূর্ব-বাংলার অন্যতম শস্য ভাণ্ডার। শেরপুর, শ্রীবর্দী, শম্ভুগঞ্জ, চন্দ্রকোণা, নখলা, নালিতাবাড়ী, হালুয়াঘাট, মুন্সীরহাট, কলসিন্দুর, শিবগঞ্জ, দুর্গাপুর, কমলাকান্দা, নাজিরপুর, তাহিরপুর প্রভৃতি ইহার বন্দর বা গঞ্জ। এইসব বন্দর হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ উৎকৃষ্ট ধান, চাউল, পাট, সরিষা, আলু, কলা, কমলা, কচু, আনারস প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য এবং শাল-গজারী কাঠ, বাঁশ, তারাই, জ্বালানী কাঠ প্রভৃতি বনজ সম্পদ বিভিন্ন জেলায় রপ্তানী হইত। মোহনগঞ্জ, নীলগঞ্জ, ভৈরব বাজার প্রভৃতি কেন্দ্র

হইতে প্রচুর মাছ রপ্তানী হইত কলিকাতা পর্যন্ত। বোরো ও শালী ধানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এই জেলার ভাটি অঞ্চল। ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় কূল বিখ্যাত ছিল সোনালী পাটের জন্য। সরিষাবাড়ী, জামালপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, ঈশ্বরগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ভৈরব এবং এলাসিং ছিল পাটের প্রসিদ্ধ আড়ত। দেশী বিদেশী জুট কোম্পানী এই সব কেন্দ্র হইতে পাট সংগ্রহ করিত। ইহা ছাড়া প্রধানতঃ সাধারণ শিক্ষায় কিশোরগঞ্জ, কুটির ও তাঁত শিল্পে টাঙ্গাইল, কাসার বাসনের জন্য ইসলামপুর, কৃষি সম্পদে নেত্রকোণা, শেরপুর এবং প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে জেলা সদর সমাধিক উল্লেখযোগ্য।

ময়মনসিংহ জেলার সংস্কৃতি উচ্চ মানের। মনসা মঙ্গল, ভাসান, জারী, ঘাটু, কবি, পালাকীর্তন, হোলী এবং বিভিন্ন পল্লিগীতিগুলি শুধু বাংলাদেশের নয়, সারা ভারতে এমনকি বিশ্ব সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে। রানী কমলা, মলুয়া, মহুয়া, আন্ধাবধু, কাঞ্চন মালা, গুনাই বিবি, একদিন, প্রভৃতি গীতিকা এই জেলার পল্লিগীতিকার ও কবিয়ালগণ কথ্য ভাষায় রচনা করিয়াছেন। কবি চন্দ্রাবতী এই জেলার মেয়ে—অমর গীতিকার। ইহাদের জন্য ময়মনসিংহ জেলা চির গৌরবান্বিত। ময়মনসিংহ জেলার এই সংস্কৃতি সম্পদ সিল্‌ভা লেভি, ষ্টেলা ক্রেমরিশ, এ্যালেন, লর্ড রোলালসে্ (মারকুইস অব জেটল্যান্ড), ডা. দ্যশান জেকা ভাইট্যাল, রোঁমারোঁলা প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত মনীষীদের উচ্চ প্রশংসা ও শ্রদ্ধালাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

> বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি কাব্যগুলি ধনীদের ফরমাসে ও খরচে খনন করা পুষ্করিনী কিন্তু ময়মনসিং গীতিকা বাংলা পল্লী হৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্তত উচ্ছসিত উৎস। অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছ ধারা। বাংলা সাহিত্যে এমন আত্মবিস্মৃত রসসৃষ্টি আর কখনও হয়নি।

ফরাসী চিত্র সমালোচক রথন্‌ষ্টাইন্‌ বলিয়াছেন—

> এই গীতিকাগুলি জগতের সাহিত্যের প্রথম পংক্তিতে স্থান পাইবে। এবং যুগে যুগে ভবিষ্যৎ বংশীয় পাঠকেরা ইহাদের নব নব সৌন্দর্যে আবিষ্কার করিবে, নারী চরিত্রগুলি সেক্সপীয়র ও রেসনীয় রমনী চরিত্রের মত য়ুরোপের ঘরে ঘরে পাঠ হওয়ার যোগ্য। মেটার লিঙ্কের নাটকে খুঁৎ ধরা যায় কিন্তু এগুলি একেবারে নিখুঁৎ। [*জীবন কথা*, ডা. দীনেশ চন্দ্র সেন]